The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 4 No. 7 & 8 February & August 2011 Page 43-62 Published on November 2014 by the Registrar, Dhaka University
ISSN-2075-3098

বাংলাদেশে চিহ্নবিজ্ঞান চর্চা: বাস্তবতা ও সম্ভাবনা

জেনিফার জাহান
সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

Semiotics plays a vital role in analyzing the world of signs around us. The major focus of this article is to discuss the progress of semiotics in Bangladesh. This study emphasizes the existing literature on semiotics in Bangladesh and West Bengal, India. It shows that most of the existing studies in this language focus primarily on literary semiotics. At the same time, relevant theories and terminologies on semiotics discussed by Bengali semioticians along with their initiatives to interpret some Bengali cultural artifacts have also been discussed here.

চাবি শব্দ ঃ চিহ্নবিজ্ঞান; পাঠ বিশ্লেষণ; সাহিত্যিক চিহ্নবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ; যোগাযোগ বিজ্ঞান

১. ভূমিকা

'চিহ্নের বিজ্ঞান' বা 'যোগাযোগ বিজ্ঞান' হিসেবে পরিচিত এ জ্ঞানশাখাটির বিস্তার মুখের ভাষা থেকে শুরু করে অবাচনিক যোগাযোগের ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের বাস্তবতা (reality) যে শুধু বস্তুগত নয় বরং মানবীয় বোধ (human interpretation) সম্পৃক্ত একটি বিষয় যার সংগঠন ও অর্থায়ন কেবল সে সমাজে বসবাসকারী মানুষ নিজেই করতে সক্ষম, তারই আলোচনা চিহ্নবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। মানবীয় ভাষাকে প্রাথমিক সাংগঠনিক সংশ্রয় হিসেবে (primary modeling system) বিবেচনা করে আমাদের প্রতিনিয়ত দেখা প্রপঞ্চগুলোর নিহিত অর্থ অনুসন্ধান ও অর্থ আরোপ করার অন্যতম মাধ্যম চিহ্নবিজ্ঞান। আর তাই ভাষাবিজ্ঞানের সাথে এর লক্ষ্যগত (aim) সাদৃশ্য

রয়েছে। উপরন্তু, পাঠ বিশ্লেষণ বা Textual analysis এ জ্ঞানশাখার উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণী ক্ষমতার উদাহরণ যা, যেকোনো পাঠের ভাবার্থ অনুসন্ধান এবং একটি পাঠ কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের কাছে অর্থের ভিন্নতা তৈরি করে তা বিশ্লেষণ করে। মুখের ভাষা শ্রেষ্ঠ না ভাষার লিখিত রূপ, এ বিষয়ক চিরায়িত দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর পরিধিতে ভাষা বিশ্লেষণী চিন্তাধারা সৃষ্টিতে চিহ্নবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ভাষা, ইশারা-ইঙ্গিত, সাহিত্য, মিডিয়া, রেডিও, সামাজিক প্রথা, রীতি-নীতিসহ প্রতিটি সংগঠন চিহ্নের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা সম্ভব বলে নাজারোভা (Nazarova, ১৯৯৬) উল্লেখ করেছেন। একটি পূর্ণ জ্ঞানশাখা না হলেও চিহ্নবিজ্ঞানকে একটি 'তথ্যানুসন্ধান' প্রক্রিয়া উল্লেখ করে ডেভিড স্লেস (১৯৮৬) বলেছেন, It's a vantage point to survey our world' (উদ্ধৃত চ্যান্ডলার (Chandler), ১৯৮৬, চ্যান্ডলার কর্তৃক উপস্থাপিত)। বর্তমান পৃথিবীতে কোনো তথ্য বা পাঠ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গের সাথেই চিহ্নবিজ্ঞানের নাম জড়িত; তাই বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমবিকাশমান এ জ্ঞানশাখাটি চর্চার বর্তমান পরিস্থিতি অর্থাৎ, আমাদের কাছে এর প্রযোজ্যতা কতটুকু তা বিশ্লেষণই এ প্রবন্ধের লক্ষ্য।

এ প্রবন্ধের আলোচনাতে তাই প্রাসঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে- 'চিহ্নবিজ্ঞান: তত্ত্ব অনুশীলন', এবং 'চিহ্নবিজ্ঞান: প্রায়োগিক চর্চা'।

প্রথমাংশে চিহ্নবিজ্ঞানে ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর, চার্লস স্যান্ডার্স পার্স, রঁলা বার্থ সহ খ্যাতিমান চিহ্নবিজ্ঞানীদের তত্ত্ব ও সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী অংশে চিহ্নবৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোর প্রয়োগ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে যে ক্ষেত্রগুলোতে করা হয়েছে তার আলোচনার প্রথম তুলে ধরা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়গুলো বাংলাদেশে এ জ্ঞানশাখা চর্চার বর্তমান পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, আলোচনার সুবিধার্থে বিভিন্ন লেখক রচিত গ্রন্থগুলোতে পারিভাষিক শব্দগুলো তাঁরা যেভাবে ব্যবহার করেছেন, সেভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে।

২. চিহ্নবিজ্ঞান: তত্ত্ব অনুশীলন

চিহ্নবিজ্ঞানের বিভিন্ন অভিধা (terminology), তাদের সংজ্ঞার্থ-পরিচিতি, বিভিন্ন শাখা (branches), গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তাত্ত্বিকতা, পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, অন্যান্য জ্ঞানশাখার সাথে এর তুলনামূলক আলোচনা ইত্যাদি প্রাথমিক আলোচনা এ পর্যায়ভুক্ত। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে চিহ্নবিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থ ও প্রবন্ধে প্রাপ্ত আলোচনাগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এ শ্রেণিতে মূলত ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর-এর ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তা যা পরবর্তীকালে তাঁর চিহ্ন-চিন্তারূপে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তা-ই আলোচ্য। পুরোপুরি তাত্ত্বিক ধারা অনুসরণ না করলেও সোস্যুরের চিহ্নের দ্বি-মাত্রিক (dyadic) মডেল উল্লেখপূর্বক এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধারণা ও প্রপঞ্চগুলোর ব্যাখ্যা এবং বর্ণনাই বিশেষত এ পর্যায়ভুক্ত। এছাড়াও অন্যান্য প্রখ্যাত চিহ্নবিজ্ঞানীদের তত্ত্ব (theory) বিষয়ক প্রায় প্রাথমিক (elementary) পর্যায়ের

আলোচনাগুলোও এ অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লক্ষণীয়, মূল তত্ত্বগুলোর আলোচনা সরাসরি না করে কেবল তত্ত্বের সাথে সম্পৃক্ত ধারণাগুলো নিয়েই এ গ্রন্থগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ্য মঈন চৌধুরীর দু'টি গ্রন্থ যথাক্রমে 'সৃষ্টির সিঁড়ি' (১৯৭৭) এবং 'ইহা শব্দ' (২০০৪)। এ বই দুটিতে মূলত ভাষা-দর্শন, নন্দন তত্ত্ব, কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্ব এবং জাক দেরিদার বিনির্মাণবাদ বা ডিকন্সট্রাকশন তত্ত্ব আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর চিহ্নবিজ্ঞান বিষয়ক ধারণাগুলো। ১৯৬০ এর দশকের প্রথম দিকে কাঠামোবাদী সাহিত্য তত্ত্বের উদ্ভব হলেও 'সাহিত্য দর্শন' হিসেবে পরবর্তীকালে এ তত্ত্বটি যে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিল তা লেখক তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। প্রচলিত বিশ্বাসে সাহিত্যকর্মকে একজন লেখকের জীবন ও জগৎবীক্ষণের প্রতিফলিত রূপ মনে করা হলেও কাঠামোবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিকেরা যে এর বিপরীত অবস্থানে ছিলেন তা এ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। মঈন চৌধুরী বলেন, 'লেখক তাঁর সৃষ্টির পরই মৃত এবং সাহিত্য সবসময়ই সত্যের সাথে সম্পর্কহীন' (চৌধুরী, ১৯৯৭:৪২)। এ ধারণাটিই কাঠামোবাদী সাহিত্যদর্শনে লালন করা হয়েছে।

'সৃষ্টির সিঁড়ি' গ্রন্থটিতে 'কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও ভাষাদর্শন' এবং 'দেরিদার ডিকন্সট্রাকশন: তাত্ত্বিক বিচার' প্রবন্ধ দুটির আলোচনায় পূর্বকথা রূপে স্থান পেয়েছে 'সোস্যুরের ভাষাতাত্ত্বিক পটভূমি'। কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বের ধ্যান ধারণার পক্ষে সোস্যুরের ভাষাদর্শন এবং প্রসঙ্গক্রমে রঁলা বার্থের কাঠামোবাদী বক্তব্যসমূহ কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ সে বিষয়ক বিশদ আলোচনাই মূলত এ প্রবন্ধটির মূল প্রতিপাদ্য। প্রবন্ধটির আলোচনার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুরের কাঠামোবাদ বা সাংগঠনিকবাদ। লেখক মনে করেন যে, কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বের উৎস হিসেবে কাজ করে সোস্যুরের 'কাঠামোকেন্দ্রিক ভাষাতত্ত্ব' (structural linguistics)। এমনকি রঁলা বার্থ, রোমান ইয়াকবসন, ক্লদ লেভিস্ত্রাউস এর মতো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যতাত্ত্বিকেরা সোস্যুরের ভাষাদর্শনকে কেন্দ্র করে কাঠামোবাদী সাহিত্যের বিভিন্ন সূত্র, প্রকল্প ও ধারণা গড়ে তুলেছেন বলেও লেখক অভিমত প্রকাশ করেছেন। সাহিত্য সৃষ্টির দর্শন বা সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক যে কোনো আলোচনাতেই ভাষা চিহ্নের (Linguistic Sign) সাথে বস্তু, ধারণা কিংবা বিষয়ের সাথে কী সম্পর্ক তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন; আর সোস্যুরের ভাষাতত্ত্বের মাধ্যমেই ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক আধুনিক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। এছাড়াও ধ্রুপদী ভাষাদর্শনের সাথে তুলনা করে সোস্যুরীয় 'দ্যোতক' (signified) এবং 'দ্যোতিত' ধারণা দুটি আলোচিত হয়েছে এ গ্রন্থটিতে। মঈন চৌধুরী দেখিয়েছেন ধ্রুপদী ভাষাদর্শনে 'ভাষাপ্রতীক বা শব্দ = বস্তু বা বিষয়'। কিন্তু, সোস্যুর এ সমীকরণটিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে তাঁর দ্যোতক ও দ্যোতিতের ধারণা দুটি দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে; 'একটি শব্দ ভাষাপ্রতীক প্রকৃতপক্ষে শুধু একটি চিহ্ন হিসেবেই ভাষায় অবস্থান করে থাকে এবং ভাষা ব্যবহারের সময় একটি শব্দ উচ্চারিত কিংবা লেখা হলে এই ভাষাচিহ্ন কিংবা শব্দদ্যোতক (signifier) হিসেবে কোনো একটি

নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুকে দ্যোতিত (signified) করে' (চৌধুরী, ২০১২: ২৩২)। তিনি দেখিয়েছেন-

$$\text{ভাষাচিহ্ন} = \frac{\text{দ্যোতক}}{\text{দ্যোতিত}}$$

সোস্যুরীয় ভাষাচিহ্নে একটি মুদ্রার এপিঠ ওপিঠের মতো দ্যোতক-দ্যোতিতের অবস্থান বলে মঈন চৌধুরী অভিমত প্রকাশ করেছেন। একটি ট্রাফিক সিগন্যালে ব্যবহৃত লাল বাতি, সবুজ বাতি এবং হলুদ বাতি আমাদের মনে তিনটি ভিন্নমাত্রার দ্যোতক-দ্যোতিতের সূচনা করে। একটি নির্দিষ্ট ভাষা ব্যবস্থার আওতায় ভাষাচিহ্ন দ্যোতক ও দ্যোতিতের সম্পর্ক বোঝার জন্য ট্রাফিক বাতির এই উদাহরণটি কার্যকর উদাহরণ হতে পারে বলে মঈন চৌধুরী উপস্থাপন করেছেন।

এছাড়াও দ্যোতক/দ্যোতিত সৃষ্ট অর্থের স্বেচ্ছাচারিতা বা arbitrariness-এর কথাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সোস্যুরের ভাবনার সাথে তাল মিলিয়ে মঈন চৌধুরী মনে করেন সোস্যুর নির্দেশিত এ সম্পর্ক স্বেচ্ছাচারী কারণ, একটি ভাষা সংশ্রয়ে 'ভাষাচিহ্ন' দেশ-কাল মাত্রায় অন্যান্য চিহ্নদলের সাথে তুল্য হয়ে সৃষ্টি করে কোনো দ্যোতক এবং তার দ্যোতনা; ফলে, একটি দ্যোতিতের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়। যেমন: 'লাল' হতে পারে যুদ্ধ, রক্ত, কিংবা সিঁদুর এর উপস্থাপক; আবার, আমরা 'লাল' কে সবুজ বা হলুদ কিংবা বেগুনি নয় বলেই লাল হিসেবে গ্রহণ করি। ধ্রুপদী ভাষাদর্শনে যেখানে একটি শব্দভাণ্ডারের প্রতিটি শব্দ কোনো না কোনো ভাবে বৈশ্বিক বস্তু বা বিষয় ও ধারণার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক যুক্ত, তারই বিপরীতে সোস্যুরীয় ভাষা চিহ্নের অবস্থান- এই বিষয়টির সুস্পষ্টতাকেই মঈন চৌধুরী তার দ্যোতক-দ্যোতিত বিষয়ক আলোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

সাহিত্য বিশ্লেষণে কাঠামোবাদী তত্ত্ব ব্যবহার সম্পর্কে লেখকের অভিমত হলো যে, কাঠামোবাদী তত্ত্ব ব্যবহার করে সাহিত্য বিশ্লেষণ করা হলেও উভয় জ্ঞান বিশ্লেষণে ব্যবহৃত তত্ত্ব সম্পূর্ণ এক নয়; যে কাঠামো ব্যবহার করে সোস্যুর ভাষা বিশ্লেষণ করেছেন, একই রকম একটি কাঠামো প্রয়োগ করা সম্ভব কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বে। আবার, এই কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই চালর্স স্যান্ডার্স পার্স এর প্রতীক, প্রতিমা এবং সূচক ধারণা তিনটির উপস্থাপন করেছেন লেখক, তবে, ভিন্ন পরিভাষার মাধ্যমে। তাছাড়াও, কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বের ধারণাকে প্রসারিত করতে রঁলা বার্থ-এর আলোচনাও পাওয়া যায় এ গ্রন্থটিতে। কোনো ভাষিক চিহ্নের সম্পূর্ণতা আনতে এর অন্তর্ভুক্ত চিহ্ন সমূহের রৈখিক (systematic) ও উল্লম্ব (paradigmatic) বিন্যাস যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা রঁলা বার্থ এর কাপড় নির্বাচন (আমাদের পরিধেয় ভিন্ন ভিন্ন কাপড় মূলত একেকটি প্যারাডাইম সেট থেকে নির্বাচিত) বিষয়ক একটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। প্রসঙ্গত সংযুক্ত হয়েছে রোমান ইয়াকবসনের নাম। সরাসরি চিহ্নবিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা এ বইটির প্রতিপাদ্য না হলেও

সাহিত্যতত্ত্ব, কাঠামোবাদ, ভাষাদর্শনে চিহ্নবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পদচারণা এখানে তুলে ধরা হয়েছে যা লক্ষণীয়।

'ইহা শব্দ' (২০০৪) বইটিতে 'জাক দেরিদার দর্শন: শব্দব্রহ্ম, বিচ্ছেদ ও বিনির্মাণ' শীর্ষক প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত। 'সমকালীন ভাষাতত্ত্ব' উপশিরোনামে বিংশ শতাব্দীর ভাষাতত্ত্ব বা Linguistics এর সম্পৃক্ততা দেখানো হয়েছে দর্শনের সাথে। লেখকের মতে এ শতকে দার্শনিক চিন্তা চেতনায় নতুন উপদান সংযুক্ত হয়েছে ভাষাতত্ত্ব থেকে। মার্কিন ভাষা দার্শনিক এডওয়ার্ড সাপির (Edward sapir) এর বক্তব্য অনুসারে লেখক বলেছেন, 'ভাষা কোনোভাবেই মানুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, একজন মানুষের মাতৃভাষা এবং ভাষা প্রয়োগের নিয়মাবলিই নির্ধারণ করে একটি মানুষর চিন্তা- চেতনা, মনন, সামাজিক আচার ব্যবহার এবং তার দৈনন্দিন কর্ম-ক্রিয়া' (চৌধুরী, ২০০৪ : ২৩০)। এছাড়াও দার্শনিক বেঞ্জামিন লি হোর্ফ (Benjamin Lee Whorf) সাপিরের ভাষাদর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং তাদের নির্দেশিত মাতৃভাষার সাথে মানুষের চিন্তা চেতনার গভীর সম্পর্ক বিষয়ক ধারণাটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে বলেছেন লেখক এ গ্রন্থে।

এছাড়াও, ভাষাতত্ত্বে ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুরের অবদানের কথা এতে আলোচিত হয়েছে। প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন সম্পূর্ণ ভাষা ব্যবস্থা (language system)-র অন্তর্গত উপাদানকে সোস্যুর লঁগ (langue) বা ভাষাসত্তা এবং প্যারোল (parole) বা বাক্-এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। মানুষের ভাষা যে মূলত ভাষা-চিহ্নের কোনো জৈবিক সংগঠনেরই সমন্বয় তা বোঝানোর জন্যই তিনি লঁগ এবং প্যারোল ধারণা দুটির আলোচনা তুলে এনেছেন। মঈন চৌধুরী মনে করেছেন লঁগ ও প্যারোল যৌথভাবে মানুষের ভাষাসত্তাকে প্রমাণ করে যা মানুষকে অস্তিত্বশীল করে তুলতে কার্যকর। জাক দেরিদার বিনির্মাণ (deconstruction) তত্ত্ব প্রসঙ্গে কিছুটা চিহ্নের আলোচনা এ বইটিতে পাওয়া যায়। সোস্যুরের চিহ্নের স্বেচ্ছাচারিতা ধারণাটির পক্ষে দেরিদার অবস্থান হলেও চিহ্নের সব ধারণা যে দেরিদা মেনে নেননি তা এখান থেকে জানা যায়। 'দ্যোতক ও দ্যোতিতের যে আদৌ-কোনো ধ্রুব সম্পর্ক নেই, সোস্যুরের এ বক্তব্য-দেরিদা মেনে নেন কিন্তু, ধ্রুপদী চিহ্নতত্ত্বের (classical semiology) বা সোস্যুরের তত্ত্বে উল্লিখিত সব ধারণার সাথে একমত নন দেরিদা' (চৌধুরী, ২০১২:২৩৬)।

'ইহা শব্দ' বইটিতে প্রাপ্ত চিহ্ন সংক্রান্ত আলোচনাগুলো মূলত ভিন্নভাবে চিহ্ন ধারণাটি উপস্থাপনেরই চেষ্টা যা দর্শন কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিহ্নবিজ্ঞানকে দেখায় সুযোগ করে দিয়েছে। এছাড়াও মিশেল ফুকো, জাক দেরিদা তাঁদের তাত্ত্বিক ধারণার পদচারণা যে সোস্যুর-এর চিহ্ন ধারণা থেকেই শুরু করেছেন, তা-ও আমরা এ গ্রন্থ থেকে জানতে পারি। তবে, দুঃখজনক হলো মঈন চৌধুরী রচিত 'সৃষ্টির সিঁড়ি' বইটিতে প্রাপ্ত কিছু প্রবন্ধের বিষয়গত পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায় 'ইহা শব্দ' বইটিতে, যা অপ্রয়োজনীয়; ভাষাচিহ্ন বিশ্লেষণে দ্যোতক-দ্যোতিতের অবস্থান, চিহ্নের স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে আলোকপাত, প্যারাডাইম বোঝাতে ট্রাফিক বাতি বা পরিধেয় বস্ত্রের উদাহরণ উপস্থাপন কেবল প্রাসঙ্গিক পুনরাবৃত্তি যা লেখককে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছে।

প্রসঙ্গঃ ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান (১৯৯২) প্রবন্ধ সংগ্রহটিতে মিহির ভট্টাচার্য্যের সেমিয়লজি/সেমিয়টিকস্ প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত। লেখক তাঁর আলোচনা শুরুই করেছেন 'সেমিয়লজি' এবং 'সেমিয়টিকস্' ধারণা দুটোর উদ্দেশ্যগত প্রভেদ তুলে ধরার মাধ্যমে। গ্রিক semeion (sign, চিহ্ন) শব্দটি থেকে এ জ্ঞানশাস্ত্রের উদ্ভব উল্লেখ করে তিনি বলেছেন- 'এই নবীন চিন্তাধারা চিহ্নের প্রকৃতি বিচারে লিপ্ত, কাজেই হয়ত একে 'চিহ্নতত্ত্ব' বলা চলে' (ভট্টাচার্য,২০১৩ : ৮৯)। চিহ্নবিজ্ঞানের দুই মহারথী- ফার্দিনাদ দ্য সোস্যুর এবং চালর্স স্যান্ডার্স পার্স যথাক্রমে এ জ্ঞানশাখাকে সেমিয়লজি এবং সেমিয়টিক বলে উল্লেখ করেছিলেন বলে জানা যায়, যা কেবল তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতার পরিচায়ক। প্রায় সমসাময়িক এই দুজন মনীষী ভিন্ন উদ্দেশ্য চিহ্নের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু, এ বিষয়ক তাঁদের আলোচনা দীর্ঘ নয় । তবুও সোস্যুর এবং পার্স এর প্রাথমিক উদ্যোগ থেকেই আজ চিহ্নবিজ্ঞান জ্ঞানশাখাটি এতটা আলোচিত ও বিস্তার লাভ করেছে বলে মিহির ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন। আর এ ধারণার ওপর ভিত্তি করেই এ প্রবন্ধটিতে লেখক সোস্যুর এবং পার্স এর প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করেছেন। পার্স এর 'সেমিয়টিক' কেবল লাজিকের নামান্তর উল্লেখ করে 'চিহ্ন' ধারণাটি যে পার্সীয় দর্শনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে তা আলোচনা করা হয়েছে। 'চিহ্ন' কেবল অন্য কিছুকে নির্দেশ করে এই ধারণা থেকেই পার্স চিহ্নের তিনটি সরল বৈশিষ্ট্য–'ভিত্তি' (ground), 'বস্তু' (object) এবং 'চিহ্নের মানস প্রতিরূপ' (interpretant) দিয়েছিলেন। লেখকের মতে পার্স তার সেমিয়টিকে চিহ্নের সাথে বস্তুর সম্পর্কই দেখিয়েছেন এবং জটিল ও বিশাল একটি দার্শনিক সংশ্রয়ের সৃষ্টি করেছেন।

তাছাড়াও সাহিত্য বিষয়ক সেমিয়লজিতে পার্স-এর চিহ্নের তিনটি বিভাগ 'প্রতিমা' (icon), 'সূচক' (index) এবং 'প্রতীক' (symbol) এর তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। পার্স এবং সোস্যুর এর চিন্তার পার্থক্য খুব বেশি নয় বরং তাঁদের উদ্দেশ্যগত তারতম্য প্রধান বলে আলোচনা করা হয়েছে এতে। মূক বধিরদের ভাষা অথবা যে কোনো সংকেত হতে পারে চিহ্নভুক্ত- উল্লেখ করে সোস্যুর ভাষাবিজ্ঞানকে সেমিয়লজির একটি শাখা হিসেবে দেখেছেন। চিহ্নক (signifier) এবং চিহ্নিত (signified) এর সমন্বয়ে গঠিত চিহ্নের কথা উল্লেখ পূর্বক-এর স্বেচ্ছাচারী বা অবাধ চরিত্রের কথাও স্থান পেয়েছে এ আলোচনায়। তাছাড়াও, চিহ্নবিজ্ঞান এর বাইরে সোস্যুরীয় ভাষাতত্ত্বের বেশ কয়টি যুগ্ম বৈপরীত্য (binary opposition) যেমন- এককালীন/কালানুক্রমিক, লঁগ/প্যারোল পদগত/পরম্পরাগত সম্পর্ক রয়েছে যা বহুল প্রচলিত এবং সোস্যুরীয় সেমিয়লজিতে গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরা হয়। পরম্পরাগত সম্পর্কের উদাহরণস্বরূপ, চলচ্চিত্রের প্রতিমার কথা বলা হয়েছে এবং 'রাম ভাল ছেলে'– এ বাক্যটির পদগুলোয় বিকল্প (যেমন, 'রাম' এর স্থলে 'শাম') দেখিয়ে চিহ্ন সিস্টেমের পদগত সম্পর্কের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বৈপরীত্য রোমান ইয়াকবসনের আলোচনায় 'metaphor-metonymy' দ্বন্দ্ব আকারে দেখা যায় বলে লেখক আলোচনা করেছেন।

মানুষের সৃষ্টি যেকোনো কিছুই তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যর বাইরে সেমিয়লজিভুক্ত হতে পারে বলে ক্লদ লেভিস্ত্রাউস এর `mythologique' থেকে রান্না ও খাওয়ার সিস্টেমের উদাহরণ দেখানো হয়েছে। আলোচনায় স্থান পেয়েছে 'চিহ্নের বাস্তবতা'; যেমন, একটি লাল নিশান-এর আকার আকৃতি ছাড়াও এর সামাজিক বাস্তবতা থাকতে পারে যা সামাজিক জীবনের সম্পর্কগুলোকে প্রতিফলিত করতে পারে (যেমন: বিপদ সংকেত, কোনো বিপ্লবী জনগণের প্রতিবাদের হাতিয়ার ইত্যাদি)। এই সামাজিক বাস্তবতা যা চিহ্নের প্রাথমিক অর্থের অতিরিক্ত রূপে ব্যবহৃত তা-ই সোস্যুরীয় সেমিয়লজির মূল কথা বলে আলোচিত হয়েছে।

পরবর্তীকালে রলাঁ বার্থ, মিশেল ফুকো বা জাক দেরিদা কীভাবে সেমিয়লজিকে অন্য প্রবাহে এগিয়ে নিয়েছেন তার বর্ণনাও পাওয়া যায় এ প্রবন্ধে; যার ফলে 'semanalysis' বা চিহ্ন বিশ্লেষণ এবং 'semioclasm' বা চিহ্ন বিনাশ ধারণা দুটির সাথে পরিচিতি লাভ করা যায়। চিহ্নের সাথে চিহ্নের অসীম সম্পর্ক এবং সংশ্রয়ের সাথে সংশ্রয়ের জটিলতার কথা উল্লেখ করে সেমিয়লজি এবং সাংগঠনিকতাবাদ এর সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেছেন লেখক। মিহির ভট্টাচার্য্যের মতে চিহ্নের সংশ্রয়ের সম্পর্কের ভিত্তিতে অনেক তত্ত্ব জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়েছে কিন্তু, জটিলতা সৃষ্টি করে এসব বিপরীত মতবাদগুলো যা সংশ্রয়ের সাথে সংশ্রয়ের (system) সংসক্তি সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও লেখক মনে করেন তাত্ত্বিকদের চিহ্ন সিস্টেম ব্যাখ্যাত হয় চিহ্নাতীত বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে; কিন্তু অধিভাষা (meta language)-গুলোরও বৈজ্ঞানিক ধারণাগত ভিত্তি প্রয়োজন। তাই প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন, "চিহ্নতত্ত্ব বিজ্ঞানের বিকল্প নয় বা বিজ্ঞানোত্তর কোনও বৃহত্তর জ্ঞানও নয়" (ভট্টাচার্য্য, ১৯৯২: ৯৪)। বিজ্ঞানের কিছু ধারণাকে স্পষ্ট করার পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নবিজ্ঞানকে অভিহিত করে লেখক তার চিহ্ন সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করেছেন। এ প্রবন্ধটি থেকে চিহ্নবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত করে অধিভাষা, চিহ্নবিনাশ ইত্যাদি কিছু নতুন ধারণা যা পরবর্তীকালে চিহ্নবিজ্ঞান ও সাংগঠনিকতাবাদের আলোচনায় ফলপ্রসু ভূমিকা রেখেছে সেগুলোর সাথে আমরা পরিচিত হতে পারি ।

"শব্দ ও অর্থ শব্দার্থের দর্শন"(২০১১) গ্রন্থটিতে রমা প্রসাদ দাস 'চিহ্নের গুরুত্ব', 'চিহ্ন ও চিহ্নিতের সম্বন্ধ', 'চিহ্নের প্রকারভেদ: প্রাকৃতিক চিহ্ন ও প্রবর্তিত চিহ্ন'(১), 'চিহ্নের প্রকারভেদ (২) : প্রতিরূপ, জ্ঞাপক ও প্রতীক','প্রবর্তিত চিহ্নের বৈশিষ্ট্য', 'শব্দ ও প্রতীক : প্রতীক এর বিভিন্ন অর্থ' এবং 'শব্দ ও প্রতীক' শিরোনামে মূলত সোস্যুর ও পার্স নির্দেশিত চিহ্নতত্ত্বের প্রাথমিক আলোচনাগুলোই করেছেন। তিনি বেশ কিছু উদাহরণের সাহায্যে চিহ্নবিজ্ঞান-এর মৌলিক ধারণাগুলো তুলনামূলকভাবে পরিচ্ছন্ন ও সহজ ভাষায় তুলে ধরেছেন। চিহ্নবৈজ্ঞানিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার আলোচনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন না করলেও 'চিহ্নবিজ্ঞান' এর শিক্ষার্থীদের জন্য নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। তিনি চিহ্নের প্রকারভেদ দেখিয়েছেন দুইভাবে; প্রথমত, 'প্রাকৃতিক চিহ্ন' ও 'প্রবর্তিত চিহ্ন'– যা উমবার্তো একোর 'natural sign' এবং 'artificial sign' প্রকারভেদ দুটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে লেখক এখানে কোনো

তাত্ত্বিকে নাম উল্লেখ করেননি। দ্বিতীয়ত, পার্স এর নাম উল্লেখপূর্বক 'প্রতিরূপ' (icon), 'উপস্থাপক' (index) এবং 'প্রতীক' (symbol) এই তিনটি পরিভাষার মাধ্যমে পার্স নির্দেশিত চিহ্নের শ্রেণি দেখিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে, উভয় প্রকার চিহ্নের শ্রেণিগুলো আলোচনার ক্ষেত্রেই লেখক যথেষ্ট পরিমাণ উদাহরণ ব্যবহার করেছেন যা নতুন শিক্ষার্থীসহ এ বিষয়ে কৌতূহলপ্রবণ যে কোনো মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়াও, রমা প্রসাদ প্রতীক-এর বিভিন্ন অর্থ তুলে ধরেছেন যেমন, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-এর মতে প্রতীক অর্থ- 'নিদর্শন' অথবা 'চিহ্ন'; হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে প্রতীক মানে 'প্রতিকৃতি' ইত্যাদি। শব্দ প্রতীক (verbal symbol) এবং অশাব্দ প্রতীক (non verbal symbol)-এ দুভাগে প্রতীকের শ্রেণিবিভাজন ও দেখানো হয়েছে। সব প্রতীকই চিহ্ন হবে কিন্তু, সব চিহ্নই প্রতীক শ্রেণিভুক্ত নয় উল্লেখ করেও তিনি চিহ্ন ও প্রতীকের পার্থক্য দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন। একইভাবে 'অশাব্দ প্রতীক'কে শব্দ বলে চিহ্নিত করে শব্দের সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন লেখক।

চিহ্নবিজ্ঞানের অন্যান্য তত্ত্ব বা তাত্ত্বিকদের সম্পর্কে কোনো আলোকপাত না করা হলেও 'চিহ্ন' ধারণাটি স্পষ্ট করে তোলার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় লেখা এ প্রবন্ধটি বাঙালি শিক্ষার্থীদের জন্য সহজবোধ্য একটি পাঠ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

ড. অভিজিৎ মজুমদার তাঁর 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব' (২০০৭) গ্রন্থে সোস্যুরের তত্ত্বাদর্শ' শিরোনামের অধীনে সোস্যুরের ভাষাতত্ত্ব ও চিহ্নবিজ্ঞান সংক্রান্ত ধারণাগুলোতে আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছেন। মূলত সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়েই তিনি সোস্যুর প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। সাহিত্যতাত্ত্বিক বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায় 'অবয়ববাদ' (structuralism) বলেই লেখক উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন যে, অবয়ববাদী তত্ত্বের মূলে রয়েছে বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক এবং আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের জনক ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর। 'তাঁর তত্ত্বাদর্শ শুধু যে ভাষার অবয়ব ব্যাখ্যা করে তা নয়, সমাজ ও সংস্কৃতির বিস্তীর্ণ এলাকায় এই তত্ত্ব ভাবনার প্রয়োগ দেখতে পাই আমরা' (মজুমদার, ২০০৭: ১৬২)। লেখকের এ আলোচনার প্রায় পুরোটাই ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর-এর তত্ত্বাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। সোস্যুর ভাষাকে চিহ্নের সংস্থান (system) হিসেবে উল্লেখ করে কীভাবে দ্যোতক-দ্যোতিত এর বিভাজন দেখিয়েছেন তা এখানে আলোচিত। দ্যোতক যে মূলত মানসিক প্রতিচ্ছবি, বস্তু নয়, তা এখানে আলোচনা করা হয়েছে। চিহ্নের স্বেচ্ছাচারিতা বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ তুলে ধরে লেখক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 'বাঙালি নেহাতই সামাজিক প্রথাকে' (convention), সম্বল করে দ্যোতক-দ্যোতিতের সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক নির্মাণ করে' (মজুমদার, ২০০৭:১৬২)।

তাছাড়াও সোস্যুরের এককালীন-কালানুক্রমিক, পদগত-পরম্পরাগত, লঁগ-প্যারোল এই দ্বৈতীয়িক বৈপরীত্যগুলো সম্পর্কে মোটামুটি-পরিচ্ছন্নভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই বইটিতে। তবে উল্লেখ্য যে, চিহ্নবিজ্ঞান বিষয়ক নতুন কোনো তথ্য যা অন্য বইগুলোতে

সংযেজিত হয়নি তা এখানেও অনুপস্থিত এবং চিহ্নবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ হিসেবে এটি তেমন একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি বলে আমি মনে করি।

শিশির ভট্টাচার্য্য তাঁর 'অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ' (২০১৩) গ্রন্থটিতে 'চিহ্নবিজ্ঞান ও অর্থতত্ত্ব' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যে কোনো সংস্কৃতিকে 'চিহ্নের সমষ্টি' বলে উল্লেখ করে লেখক বলেছেন, 'প্রতিটি সম্প্রদায়, জনসমষ্টি বা সমাজের রয়েছে আলাদা আলাদা সব চিহ্ন। কোথায়, কখন, কার সাথে, কীভাবে, কোন চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে ভাষার মতোই এসব কিছু শিখতে হয় সংশ্লিষ্ট জনমসষ্টির সদস্যদের' (ভট্টাচার্য্য, ২০১৩ : ১৩০)। অর্থাৎ সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে নির্দিষ্ট চিহ্নের উপস্থিতি ও ব্যবহার প্রতিটি মানুষকে জানতে হয় বলে উল্লেখ করেই লেখক তাঁর চিহ্নবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা শুরু করেছেন।

প্রতিমা, প্রতীক, সংকেত, সূচক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন অধ্যয়নই চিহ্নবিজ্ঞানের লক্ষ্য বলে এ গ্রন্থে আলোচনা স্থান পেয়েছে। ভাষাভেদে সংকেত সমষ্টির আলোচনা এবং প্রতীক ও প্রতিমার সার্বজনীন গ্রহনযোগ্যতা তুলে ধরে সর্বোপরি চিহ্নসমূহের উদ্ভব, বিকাশ এবং বিচার বিশ্লেষণ করে বলেই সেমিওলজি বা সেমিওটিক্স্ এর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ভাষাবিজ্ঞান এর সাথে চিহ্নবিজ্ঞানেরর সংশ্লিষ্টতা তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন-' ভাষা চিহ্নের সমষ্টি। সুতরাং একদিক থেকে দেখলে ভাষাবিজ্ঞান সেমিওলজি বা চিহ্নবিজ্ঞানেরই একটি শাখা' (ভট্টাচার্য্য, ২০১৩: ১৩১)। তবে এদের গুরুত্বপূর্ণ পাথর্ক্যের ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন। প্রবন্ধে যেভাবে লেখক ভাষা সৃষ্টির জন্য 'সংকেত' নামক বিশেষ চিহ্নের উপস্থিতির প্রয়োজন আছে বলে উল্লেখ করেছেন, তা নি:সন্দেহে প্রমাণ করে যে, চিহ্নের বিন্যাস এবং সংকেতের সমষ্টিতে ভাষা তৈরি বিষয়ক তাঁর আলোচনা এই দুই জ্ঞানশাখার সম্পর্ক অনুধাবনে সহায়ক ভুমিকা পালন করতে পারবে।

প্রবন্ধটির প্রথমাংশ 'সেমিওলজি বা চিহ্নবিজ্ঞান' উপশিরোনামভুক্ত। চিহ্নবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু, সচরাচর আলোচনায় স্থান পায় না এমন কিছু চিহ্নবৈজ্ঞানিক ধারণার বিশদ ব্যাখ্যা তাঁর এ প্রবন্ধটিতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে গুরুত্ব দিয়ে যে ধারণাটি তিনি তুলে ধরেছেন, তা হলো-দ্যোতক (signifier) এবং নির্দেশিত (referent)-এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ। এ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'সাদৃশ্য মূল্য', 'প্রতিমা প্রতীকের সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা', 'সংকেত', 'সংকেতের বিন্যাস', ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। জার্মান চিন্তাবিদ Gottlob Frege এর একটি উদাহরণ তিনি দ্যোতিত ও নির্দেশিতের সম্পর্ক বোঝাতে দেখিয়েছেন- 'শুকতারা' ও 'সন্ধ্যাতারা' দুটি ভিন্ন দ্যোতক এবং দ্যোতনার সৃষ্টি করলেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আমরা জানি যে শুক্র গ্রহই ভোরের আকাশে 'শুকতারা' আর সন্ধ্যার আকাশে 'সন্ধ্যাতারা' নামে পরিচিত। ফলে দেখা যায় দ্যোতক এবং দ্যোতিত ভিন্ন হলেও এদের 'নির্দেশিত' এক।

এছাড়াও, পূর্ণ সাদৃশ্যযুক্ত দ্যোতকটি 'প্রতিমা' যা বস্তুর প্রায় অবিকল প্রতিরূপ, দ্যোতক নির্দেশিতের সাদৃশ্য নেই কিন্তু অবস্থান সম্পর্কে জানান দিলে তা 'সূচক' এবং দ্যোতক ও নির্দেশিতের সাদৃশ্য কিছুটা হলেও পাওয়া গেলে তা 'প্রতীক' বলে তিনি পার্স এর চিহ্ন শ্রেণিটিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এ প্রসঙ্গেই আলোচিত হয়েছে 'সাদৃশ্য মূল্য' (symbolic value বা value of similarity) ধারণাটি। মূলত সাদৃশ্যমূল্য বলতে দ্যোতক ও নির্দেশিতের সাদৃশ্য নির্দেশক স্কেল (scale)-কে বোঝানো হয়েছে। দ্যোতকের সাথে নির্দেশিতের সাদৃশ্য যত কমতে থাকে দ্যোতকের সাদৃশ্য মূল্যও ততই কমতে থাকবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। সাদৃশ্য মূল্যের ভিত্তিতে প্রতিমা, প্রতীক ও সংকেতের পারস্পরিক অবস্থানকে লেখক দেখিয়েছেন এভাবে- 'প্রতিমা > প্রতীক > সংকেত' (ভট্টাচার্য্য,২০১৩:১২৭)।

প্রসঙ্গত আলোচিত হয়েছে আপতিক বা আর্বিত্রিক (arbitrary) প্রপঞ্চটি। দ্যোতক ও নির্দেশিতের সম্পর্ক আর্বিত্রিক হলে সে চিহ্নটিকে 'সংকেত' বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে- বাংলা ভাষায় 'প্রসাধন' কোনো দরজায় লেখা থাকলে ভাষা ব্যবহারকারীরা বুঝবে সেটি টয়লেট, কিন্তু একজন ফরাসি ভাষীর কাছে তা ধারণার বাইরে কারণ, সেখানে 'toilettes' মানে প্রসাধন। সুতরাং, বাংলা ভাষীর কাছে 'toilettes' সংকেত আর ফরাসি ভাষীর কাছে সংকেত হলো 'প্রসাধন' শব্দটি। অর্থাৎ, ভাষা মানে আলাদা আলাদা কিছু সংকেতেরই সমষ্টি বলে লেখক মনে করেন।

সংকেত আলোচনায় তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন এর 'পারস্পরিক অবস্থান' এর ওপর। 'মানুষ বাঘ মারে' না বলে যদি 'বাঘ মানুষ মারে' বলা হয়, তাহলে সংকেতায়ন সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যায়। তাই, সংকেতের বিন্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে, বিশেষ ধরনের চিহ্ন যে 'সংকেত' আর এই সংকেতের সমষ্টিই ভাষা বলেও লেখক অভিমত প্রকাশ করেছেন।

একটি চতুর্ভুজ আকারে সংকেতের একটি কাঠামো লেখক দেখাতে চেয়েছেন যেখানে চারটি কোণে চারটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার অবস্থান এবং যে সংকেতে চারটি কোণই উপস্থিত থাকে, তাকে বলা হয়েছে 'সম্পূর্ণ সংকেত' (ভট্টাচার্য্য,২০১৩:১২৭)।

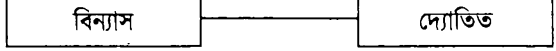

পরিশেষে, পার্স ও সোস্যুর এর মতানুসারে লেখক যেভাবে চিহ্নবিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করেছেন, তা উল্লেখ করে এ গ্রন্থটির আলোচনা শেষ করা হলো-

"একদিকে সমাজে চিহ্নসমূহের উদ্ভব, বিকাশ আর অন্যদিকে চিহ্নগুলোর বিন্যাস বিচার বিশ্লেষণ করবে যে শাস্ত্রটি তারই নাম হবে সেমিওলজি বা সেমিওটিকস" (ভট্টাচার্য্য, ২০১৩: ১৩১)।

'চিহ্নবিজ্ঞানে সোস্যুরীয় তত্ত্ব' নামক আরেকটি চিহ্ন বিষয়ক প্রবন্ধ পাওয়া যায় যেখানে মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান এবং মোসাম্মৎ মনিরা বেগম লেখকদ্বয় চিহ্নবিজ্ঞান নামক জ্ঞান শাখাটির পরিচিতিমূলক একটি রচনা উপস্থাপন করেছেন সস্যুরীয় চিহ্নের তত্ত্ব (Saussurian theory of sign) এর ওপর ভিত্তি করে। তাঁর দ্বিমুখী (dyadic) চিহ্ন মডেলটির বিভিন্ন প্রতিপাদ্য বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে এই প্রবন্ধটিতে। চিহ্নবিজ্ঞান এর প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব সোস্যুর এবং তাঁর তত্ত্বটি সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা পেতে এ প্রবন্ধটি সহায়ক।

৩. চিহ্নবিজ্ঞান: প্রায়োগিক চর্চা

প্রাচীনকালে গ্রিসের বিভিন্ন মনীষীদের জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে প্রথম চিহ্নবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও দার্শনিক কাঠামোর সূত্রপাত হয়। এমনকি, ১৭৭২ সালে ফ্রান্সে চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগের লক্ষণ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হতো এ জ্ঞানশাখাটি (ভট্টাচার্য্য, ২০১৩: ১৩১)। ১৯৯০ এর দশকে ভাষাবিজ্ঞানীরা তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয় সাধনের প্রতি অনেক বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন (নাজারোভা, ১৯৯৬)। ভাষাকে কেবল একটি চিহ্নের সংশ্রয় হিসেবে না দেখে এর প্রয়োগের প্রতি তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন। মানবীয় ভাষার বিজ্ঞান এবং চিহ্নের বিজ্ঞান-এর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে তারা এই প্রায়োগিক চর্চার প্রতি উৎসাহিত হন।

চিহ্নবিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চায় দেখা যায় যে, তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে মূলত বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর এর দ্বিমাত্রিক মডেল, চার্লস স্যান্ডার্স পার্স-এর ত্রিমাত্রিক মডেল, রঁলা বার্থ এর দ্বি-সজ্জার চিহ্নায়ন তত্ত্ব (two orders of signification)-গুলোই প্রাধান্য পেয়েছে। চিহ্নের শ্রেণিবিভাগ ও দ্যোতক-দ্যোতিতের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উপস্থাপনের ফলে সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর এবং মার্কিন দার্শনিক চালর্স স্যান্ডার্স পার্স-এর তত্ত্ব দুটি বিশেষভাবে জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত। পরবর্তীকালে নৃতত্ত্ববিদ ক্লদ লেভিস্ত্রাউস, দার্শনিক মিখাইল বাখ্তিনসহ প্রমুখ জ্ঞানচর্চাবিদদের পদচারণাও চিহ্নবিজ্ঞানের পথচলা সুগম করেছে। দেখা গেছে, সাহিত্যতত্ত্বের চিহ্নবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই বিভিন্ন সময়ে অধিকাংশ লেখকের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে যা সোস্যুর এর দ্যোতক-দ্যোতিত ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এবং চিহ্নবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ (semiotic analysis) সম্পর্কিত মৌলিক ধাপগুলো এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। লক্ষ করলে দেখা যায়, প্রায়োগিক আলোচনারও একটি বড় অংশ অধিকার করে আছে 'সাহিত্যতত্ত্ব' বিশ্লেষণে উপরিউক্ত বিভিন্ন তত্ত্বগুলোর প্রয়োগ। এছাড়াও মানবসমাজের যে দিকগুলো দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পৃক্ত এবং চিহ্ন হিসেবে গৃহীত (যেমন: সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য), সেগুলো বিশ্লেষণেও চিহ্নবৈজ্ঞানিক ধারণার প্রয়োগ সংক্রান্ত আলোচনাও পাওয়া যায় কিছু গ্রন্থে। নিচে বিভিন্ন গ্রন্থ এবং প্রবন্ধে আলোচিত চিহ্নবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রায়োগিক দিকগুলো তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশে চিহ্নবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োগ এর ক্ষেত্রে পথিকৃৎ-ভূমিকা রেখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হাকিম আরিফ। ২০০৪ এবং ২০১৩ সালে রচিত তার তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধে বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে চিহ্নবৈজ্ঞানিক ধারার প্রয়োগ করা হয়েছে। সংস্কৃতি যে মূলত অসংখ্য চিহ্নের ধারক তা লেখকের আলোচনায় প্রতীয়মান। কোনো নির্দিষ্ট সাংস্কৃতির রীতি নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, প্রচলিত ধ্যান-ধারণাগুলোও যে চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করা যায় এবং তাদের প্রায়োগিক ব্যাখ্যাও যে চিহ্নবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব তার অবতারণা লেখক সার্থকভাবেই করেছেন। কেবল তত্ত্ব নয়, চিহ্নবিজ্ঞানচর্চার ধারায় এর প্রায়োগিক দিক যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ এর ইঙ্গিত লেখক আমাদের স্পষ্টতই দিয়েছেন যা এ বিষয়ে গবেষণায় আগ্রহীদের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। ২০০৪ সালে প্রকাশিত *Semiotica* পত্রিকায় তাঁর 'Woman's body as a color measuring text: A signification of Bengali culture' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধটিতে তিনি বাঙালি সমাজে নারীদের ত্বক এর রং (ফর্সা অথবা কালো) কীভাবে তাদের আর্থ- সামাজিক অবস্থান এর চিহ্নায়ক হিসেবে কাজ করে তা বিশ্লেষণ করেছেন। বাঙালি সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়কে তিনি নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন যা প্রশংসার দাবিদার। *Southern Semiotic Review* পত্রিকাটির ১ম সংখ্যা (২০১৩)-তে প্রকাশিত লেখকের অন্য একটি প্রবন্ধ হলো- 'BEE hand gestures reflecting Bengali culture'। এখানে বাঙালি সংস্কৃতিতে প্রতিনিয়ত অবাচনিক (non-verbal) সংজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হাতের ইশারাগুলোর চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং জীবনযাত্রা (life style) বিশেষত রীতি-নীতি, সম্ভাষণ, অভিব্যক্তি, আদেশ, অনুরোধ, প্রতিজ্ঞা-তে ব্যবহৃত ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নের বিন্যাস দেখানো হয়েছে। 'চাপিয়ে দেয়া' (imposed) এবং 'অভিনীত' (pretending) এই দুই শ্রেণির BEE (Bengali Everyday Emblematic hand gesture) এর কথা তিনি বলেছেন। 'সালাম'(অভিবাদন)-কে তিনি প্রথম শ্রেণিভুক্ত এবং বিভিন্ন ধরনের স্বতঃ-প্রণোদিত (self motivated) সংজ্ঞাপক চিহ্নকে দ্বিতীয় শ্রেণির চিহ্ন বলে উদাহরণ দিয়েছেন। তাছাড়াও বাঙালি সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন যেমনঃ বিয়ে, নারীদের ব্যবহৃত ইশারা (যেমনঃ হাত দিয়ে মুখ ঢাকা), শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রকে প্রদেয় শাস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাখ্যামূলক আলোচনাও করেছেন লেখক। এ প্রবন্ধটিতে চিহ্ন যে সংস্কৃতি নির্ভর (culture based) এবং প্রতিটি সংস্কৃতি যে মূলত অজস্র চিহ্নের সমষ্টি এই বাস্তবতা অনুধাবনে এবং সমাজ ও চিহ্নের সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর এই প্রবন্ধটি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

লেখকের অন্য একটি প্রবন্ধ 'Semiotics as a Global Discipline'-যার মূল প্রতিপাদ্য হলো একটি বৈশ্বিক শৃঙ্খলা হিসেবে চিহ্নবিজ্ঞানের যথার্থতা তুলে ধরা। চিহ্নের উপস্থিতি যে, 'চিহ্নমণ্ডল' (semiosphere) থেকে জৈবচিহ্নমণ্ডল (biosemiosphere) অর্থাৎ মানবীয় কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণিজগত পর্যন্ত রয়েছে তা সংক্ষেপে এ

প্রবন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। চিহ্নবিজ্ঞানকে অর্থ তৈরির প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করে শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। পরিশেষে আধুনিক অ্যাকাডেমিক পৃথিবীতে দার্শনিক, তাত্ত্বিক কিংবা প্রয়োগগত ইত্যাদি বিভিন্ন দিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চিহ্নবিজ্ঞানের যথার্থতা তুলে ধরার প্রয়াস পাওয়া যায় এ প্রবন্ধটিতে।

'সময়ের প্রত্নতত্ত্ব ও অন্যান্য' (২০০৫) শীর্ষক প্রবন্ধ সমগ্রতে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং ভাষা সাহিত্য অনুষদের অধ্যক্ষ তপোধীর ভট্টাচার্য চিহ্নবিজ্ঞান সংক্রান্ত কিছু ধারণার সাথে 'সাহিত্যতত্ত্ব', 'আকরণবাদ' (structuralism) ও 'বিনির্মাণ' (deconstruction) এর সম্পৃক্ততা দেখিয়েছেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর এর আলোচনার মধ্য দিয়ে 'সাহিত্যচিন্তা' ও 'ভাষাচিন্তার' যুগলবন্দি যাত্রা শুরু হয়েছে বলে লেখক উল্লেখ করেন। এখন আকরোণত্তরবাদ (post structuralism) বিনির্মাণবাদ, চিহ্নবিজ্ঞান সহ নৃতত্ত্ব, মনোবিকলন, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি মানবিকী বিদ্যার বিচিত্র ক্ষেত্রে সোস্যুরের ভাষাতাত্ত্বিক ভাবনার বিপুল প্রভাব আছে বলে প্রবন্ধতে আলোচনা রয়েছে। ভাষাচিন্তার তিনটি পারিভাষিক বর্গকে ভাষা (language), সামুহিক বাচন (langue), একক বাচন (parole) রূপে অভিহিত করে বলেছেন যে, "সুস্যরের ভাষাগত অধ্যয়নের কেন্দ্র হলো 'ভাষা-পদ্ধতি'" (ভট্টাচার্য, ২০০৫:১১২)। চিহ্নের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 'চিহ্নায়ক' এবং 'চিহ্নায়িত' এর কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করে বাচন-বিজ্ঞানের (communication science) প্রধান ধারা হিসেবে চিহ্নতত্ত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং ভাষাবিজ্ঞানকে এক্ষেত্রে ধরা হয়েছে উপধারা হিসেবে। এছাড়াও চিহ্নের 'রূপগত' ও 'বিন্যাসগত' সম্পর্কের পার্থক্য অনুধাবন করার প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লেখক আরো উল্লেখ করেছেন যে, পরবর্তীকালে ১৯২৯ সালে 'আকরণবাদ' শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে ভাষাবিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবং ভাষাচিন্তার অজ্ঞাতপূর্ব সম্ভাবনা আবিষ্কৃত হয়, যার কৃতিত্ব ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর-এর ছিল। এছাড়াও সোস্যুর-এর ভাষাভিত্তিক চিন্তার লিখিত রূপ 'Course in General Linguistics'(১৯১৬) বইটি যে অন্যান্য জ্ঞান শাখায় চিহ্নতত্ত্বের ব্যবহারকে সম্প্রসারিত করেছে (যেমন: রোমান ইয়াকবসন সোস্যুর-এর ভাষাভিত্তিক চিন্তাকে 'সাহিত্য বিশ্লেষণে' সম্পৃক্ত করে এ ধারাকে প্রবহমান রেখেছেন) তা-ও সংক্ষিপ্তরূপে এখানে আলোচিত হয়েছে।

এ গ্রন্থের অন্য একটি প্রবন্ধের শিরোনাম 'উমবের্তো একো, তাঁর চিহ্নবিশ্ব'। চিহ্নবিজ্ঞানকে এই শতাব্দিতে দর্শনের একমাত্র প্রকাশ বলে একো (Eco) যেভাবে দর্শন ও চিহ্নবিজ্ঞান এর চিন্তাধারার সামঞ্জস্য দেখিয়েছেন, মূলত সংক্ষেপে তা-ই এ অংশের প্রতিপাদ্য। ইউরি লটম্যান প্রস্তাবিত চিহ্নমণ্ডল (semiosphere), ইতালিয়ান জীববিজ্ঞানী জর্জিয়ো প্রোদি কীভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞান, চিহ্নবিজ্ঞান ও জ্ঞানতত্ত্বের সাথে ভাষাদর্শন ও যুক্তিবিদ্যার সমন্বয় সাধন করেছিলেন ইত্যাদি বিষয়গুলো একোর আলোচনা প্রসঙ্গে উঠে

এসেছে এই লেখকের আলোচনা। প্রোদির চেষ্টায় জৈবচিহ্নবিজ্ঞান (biosemiotics) সৃষ্টি এবং এর ধারাবাহিকতায় 'ব্যধি-নিরোধ চিহ্নবিজ্ঞান (immunosemiotics)' নামক শাখার সৃষ্টির প্রস্তাব ইত্যাদি নতুন নতুন তথ্যগুলো এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া 'semiotic landscape' নামক ধারণাটি যে প্রথম ১৯৭৪ সালে 'International Association for Semiotic Studies' এর প্রথম অধিবেশনে ব্যবহৃত হয়েছিল সেটাও তপোধীর ভট্টাচার্যের এই প্রবন্ধ থেকে জানা যায়। উপরন্তু, চিহ্নবৈজ্ঞানিক ধারণার সংমিশ্রণে নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক চিহ্নবিজ্ঞান এর উৎপত্তির কথাসহ সংকেতের তত্ত্ব, কৃত্রিম চিহ্ন (artificial sign) তৈরির প্রয়োজনীয়তার মতো নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্ন ভিন্ন বিষয় যা চিহ্নকে আবর্তন করে গড়ে উঠেছে তার উল্লেখ রয়েছে এ প্রবন্ধে।

এই বইয়ের চিহ্নবিজ্ঞান সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রবন্ধ 'চিহ্নবিজ্ঞান, কথনবিশ্ব ও পাঠকের নির্মিতি' যেখানে আজকের তত্ত্ববিশ্বের অন্যতম প্রধান চিন্তাপ্রণালী হিসেবে চিহ্নবিজ্ঞানকে অভিহিত করা হয়েছে এবং তথ্যের (data) ভিত্তিতে সংগঠিত স্বাধীন চিহ্নায়ক (signifier)-এর গুরুত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। আকরণবাদ (sructuralism)এর পাঁজর থেকে চিহ্নবিজ্ঞানের জন্ম বলে ধরা হচ্ছে এবং প্রসঙ্গত চিহ্নায়ন (signification) এর অবশ্যম্ভাবিতার বিষয়টি দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে। চিহ্নায়কের পরম্পরায় সাহিত্যতত্ত্বে (বিশেষত কবিতা) কীভাবে বিচিত্র সব অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে তা জীবনানন্দের 'ঘোড়া' কবিতা সহ আরো বেশ কিছু কবিতার ভাষাগত ব্যাখ্যার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সবশেষে চিহ্নবিজ্ঞানের মাধ্যমেই সাহিত্যতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় উল্লেখ করে কার্ল মার্কস, এমিল ডুর্কহাইম, সিগমান্ড ফ্রয়েড, মার্টিন হাইডেগার ও মিখাইল বাখতিনের মতো যুগান্তকারী চিন্তাবিদদের আলোচনাও চিহ্নবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য বলে লেখক তাঁর আলোচনা শেষ করেছেন।

এই লেখকের আরেকটি গ্রন্থ *'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব'* (২০০৭)। এখানে আকরণবাদ, আকরণোত্তরবাদ, বিনির্মাণবাদ এবং মনোবিকলনবাদ এই বিষয়গুলো আলোচনা প্রসঙ্গে চিহ্নবিজ্ঞানী, ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর, রঁলা বার্থ-এর আলোচনা পাওয়া যায়। মূলত এ গ্রন্থে চিহ্নবিজ্ঞান বিষয়ক লেখকের পূববর্তী আলোচনাগুলোকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে পুনরায় পাওয়া যায়। আকরণবাদের প্রবক্তা সোস্যুর এবং তাঁর দ্যোতক-দ্যোতনা ধারণা সাহিত্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এ কথা আলোচিত হয়েছে; ধারণা দেওয়া হয়েছে লঁগ, প্যারোল এর অনবদ্যতা প্রসঙ্গে সস্যুরের ভাষাতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার স্বরূপ সম্পর্কে। সোস্যুরের আকরণবাদী ধারণাকে কীভাবে ইউরি লটম্যান এস্তোনিয়ার তার্তুতে বিকশিত করেছিলেন তার উল্লেখও পাওয়া যায়। উল্লেখ করা হয়েছে ক্লদ লেভি স্ত্রাউস এর 'সাময়িক নৃতত্ত্ব' ধারণাটির যা স্ত্রাউস মানবিক প্রক্রিয়ায় নিহিত পার্থক্যের সূত্রগুলো অনুসন্ধান করতে ব্যবহার করেছিলেন এবং এর ব্যাখ্যায় ব্যবহার করেছিলেন চিহ্নবৈজ্ঞানিক ধারণা।

তপোধীর ভট্টাচার্য রচিত যে দুটি বইয়ের চিহ্ন সংক্রান্ত আলোচনা এখানে উদ্ধৃত হলো সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর-এর চিহ্ন সংক্রান্ত

ধারণাগুলো অবতারণার মধ্য দিয়ে চিহ্নচিন্তা ও ভাষাচিন্তার যোগসূত্রই স্থাপিত হয়েছে। এমনকি আকরণবাদের আলোচনাকেও ক্রমান্বয়ে সাহিত্যতত্ত্ব (উদাহরণস্বরূপ কবিতার বিশ্লেষণ করা হয়েছে) বিশ্লেষণের হাতিয়ার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে, তাঁর আলোচনার বিশেষত্ব হলো কেবল সাহিত্যতত্ত্বের সীমিত ক্ষেত্রে চিহ্নবিজ্ঞান এর প্রয়োগ না করে তিনি জৈবচিহ্নবিজ্ঞান, সামাজিক নৃতত্ত্ব, মনোবিকলনবাদ, আকরণবাদ প্রভৃতি জ্ঞানশাখায় চিহ্নবিজ্ঞানের উপস্থিতির কথা তুলে ধরেছেন। ভাষাগত জটিলতা পরিহার করতে পারলে চিহ্নবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রাথমিক কিছু প্রপঞ্চ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা এ গ্রন্থ দুটি থেকে পাওয়া সম্ভব।

'বিশ শতকের সাহিত্যতত্ত্ব' (২০০৩) একটি অনুবাদ গ্রন্থ। লেখক আফজালুল বাসার এখানে "ভাষাভিত্তিক সাহিত্যতত্ত্ব" শিরোনামে আলোচনা করেছেন ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর এর দ্যোতক-দ্যোতিত ধারণা দুটি। ভাষিক চিহ্ন এই দুটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বেচ্ছাচারী বিষয় বলে অভিহিত করে তিনি বলেছেন, "ভাষা বা অন্যবিধ চিহ্নপ্রণালী (sign systeg) ব্যতিরেকে কোন বস্তু শব্দে বা শব্দসমূহে প্রকাশ লাভ করলে তা হবে একগাদা বিশৃঙ্খল অস্বতন্ত্র (undifferentiated) ধারণা-সমষ্টি" (বাসার, ২০০৩:৮০)। এছাড়াও লঁগ- প্যারোল, কালানুক্রমিক-কালকেন্দ্রিক ধারণাগুলো তিনি আলোচনা করেছেন। তবে এই লেখকের আলোচনায় একটি নতুন অভিধা সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়- "রঙিন পরিভাষাতত্ত্ব' (colour terminology); আলোকতরঙ্গের অবিরত বর্ণালীর (continuos spectrum) ওপর রঙিন পদমালা আরোপিত বিভাজনের সাথে তুলনা করে সোস্যুর একে বলেছেন "একগাদা অনির্দিষ্ট ধারণার আকর-যার ওপর অন্যান্য সকল শব্দ স্বশাসিত (arbitrary) বিভাজন আরোপ করে" (বাসার, ২০০৩: ৮২)। তবে এও বলা হয়েছে যে, সোস্যুর এই রঙিন পরিভাষা বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দেননি।

উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও লেখক 'প্রাগ চিন্তাধারা', 'রুশ প্রকরণবাদ'এবং রোমান ইয়াকবসনের 'ভাষিক কাব্যতত্ত্ব'-এর ওপর সোস্যুরের তত্ত্বের অবদান ও প্রয়োগ দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এছাড়াও 'পুরাণতাত্ত্বিক সাহিত্যতত্ত্বের' আলোচনায় রঁলা বার্থ প্রসঙ্গ এসেছে। বলা যেতে পারে, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে চিহ্নবিজ্ঞানের প্রয়োগ না দেখিয়ে লেখক সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে পাঠকদের ধারণা দিয়েছেন।

খোন্দকার আশরাফ হোসেনের গ্রন্থের শিরোনাম হলো *'টেরি ঈগলটন সাহিত্যতত্ত্ব'* (২০০৪)। এটিও একটি অনূদিত গ্রন্থ। বইটির তৃতীয় অধ্যায়-'কাঠামোবাদ ও চিহ্নবিদ্যা', যেখানে চিহ্নসংক্রান্ত আলোচনা পাওয়া যায়। তিনিও 'সাহিত্যিক আধুনিক কাঠামোবাদ'-এর জনক হিসেবে ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর-এর আলোচনা উপস্থাপন করেছেন;- সোস্যুর-এর মৌলিক ধারণা 'দ্যোতক' (ধ্বনি ইমেজ অথবা তার লেখ্য প্রতিরূপ) এবং 'দ্যোতিত' (ধারণা কিংবা অর্থ)-এর কথা উল্লেখ করে এদের 'খামখেয়ালি' (arbitrary) সম্পর্কের কথা বলেছেন। লেখকের মতে, সোস্যুর নির্দেশিত একটি চিহ্ন সংশ্রয় (sign system) এর ভেতর প্রতিটি চিহ্ন অর্থায়িত হয় অন্যান্য চিহ্নের

সাথে তার পার্থক্যের কারণে। প্রকৃত বস্তু বা সত্যিকার বস্তু (real object) সম্পর্কে সোস্যুর তেমন একটা আগ্রহী ছিলেন না বলেও লেখক মন্তব্য করেছেন।

'উপমা চিত্রকল্প ও প্রতীক চিহ্নের নন্দনতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (২০০৮) গ্রন্থটির রচয়িতা সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান। গ্রন্থটিতে উপন্যাসের ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে চিহ্নবৈজ্ঞানিক ধারণা সাশ্রয়ী বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, নন্দনতত্ত্ব সংশ্লিষ্ট আন্তঃসম্পর্কিত জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে চিহ্নবিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। উপমা চিত্রকল্প ও প্রতীকের ব্যবহার প্রাথমিকভাবে পাওয়া যায় কবিতায় এবং এর বিশ্লেষণও বহুল প্রচলিত। কিন্তু, সামাজিক মানুষের মনস্তত্ত্ব স্পর্শ করে তাদের জীবনের বাস্তবতাকে যে উপন্যাসের মাধ্যমে শৈল্পিকরূপে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব, তার অভ্যন্তরেও রয়েছে নানাবিধ উপমা, প্রতীক, চিত্রকল্পের আলংকারিক প্রয়োগ। আর এসব সাহিত্যিক আলংকারিক শব্দগুলোর তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে 'চিহ্ন' হিসেবে কারণ চিহ্ন বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড অনুসারে বিশ্বজগতের সবকিছুই চিহ্নের আওতাভুক্ত। লেখক এর মতে, 'উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীকের প্রচল নন্দনতাত্ত্বিক বিন্যাস তার চিহ্নগত অবস্থানের কারণে অধিকতর মাত্রাবহুল হয়ে ওঠে' (রহমান, ২০০৮)। তাই লেখক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে সাহিত্য সমালোচনায় চিহ্নায়নের (signification) ভূমিকা দেখাতে চেয়েছেন। সাহিত্যকর্মে প্রযোজ্য 'পাঠ বিশ্লেষণ' (textual analysis) চিহ্নবিজ্ঞানের অন্যতম মুখ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি; যার সাহায্যে সাহিত্য সমালোচনায় পাঠকৃতির অন্তর্লীন প্রতিসাম্যতা নির্দেশের চেষ্টা এ গ্রন্থে করা হয়েছে।

এছাড়াও, প্রাথমিকভাবে চিহ্নসংক্রান্ত মৌলিক ধারণাগুলোর অবতারণা করে সোস্যুর এবং পার্স এর তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা এখানে পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে রঁলা বার্থ এর 'চিহ্নায়ন তত্ত্ব', যেখানে 'বাচ্যার্থ' বা অর্থের আভিধানিক রূপের সাহায্যে প্রাথমিক সজ্জার চিহ্নায়ন (first order of signification) ব্যাখ্যাত হয় এবং 'ভাবার্থ বা অনুষঙ্গীমূলক অর্থ' বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহয্যে ব্যাখ্যা করা হয় দ্বিতীয় সজ্জার চিহ্নায়ন (second order of signification)। সাহিত্য-বিচিত্র ভাবার্থের সমন্বয় বলে বার্থ এর দৃষ্টিতে সেটা দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। এছাড়াও লেখক সংহিতা (code) যা কোনো চিহ্নকে অর্থপূর্ণ করে তোলে তা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করে বলেছেন 'সংহিতায়ন' (codification) ব্যবস্থার সহযোগিতায় সাহিত্যের ভাষা বিশিষ্ট চিহ্নতন্ত্রের (sign-system) মর্যাদাভুক্ত হয়। সাহিত্যে পদগত সর্ম্পকের (paradigmatic relationship) গুরুত্বের কথাও বলা হয়েছে যা পাঠভুক্ত চিহ্নগুলোর প্রকৃতি নির্দেশ করে ও তাদের অবস্থানের ধারাক্রমিক ব্যাখ্যা দেয়। বিভিন্ন উপন্যাস থেকে প্রতীক, উপমা ও চিত্রকল্পের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যা চিহ্নবৈজ্ঞানিক ধারণা আশ্রয়ী। মূলত প্রাচীনকালেই প্রাচ্যের আলঙ্কারিকগণ 'দেহবাদ' ও 'রসবাদ' উভয় আলোচনায় সাহিত্যিক চিহ্নের উপস্থিতি এনেছেন। তবে বর্তমান বিকাশ ধারায় প্রাচ্যের আলঙ্কারিকদের চিহ্নচর্চা 'সাহিত্য সীমা' অতিক্রম করে সর্বজ্ঞানশাখা আশ্রয়ী হয়েছে বলেও এ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

চিহ্ন বৈজ্ঞানিক পাঠবিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন আঙ্গিকে উপন্যাসের আলঙ্কারিক ভাষা বিশ্লেষণের লেখকের এ প্রয়াস মৌলিকত্ব ও প্রশংসার দাবী রাখে।

'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' পাঠের রকমফের পাঠবিবিধতার নন্দনতত্ত্ব- নামক প্রবন্ধটিতে লেখক মোহাম্মদ আজম একটি গল্পের পাঠ বিশ্লেষণ করেছেন। সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্‌র সর্বাধিক পঠিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হিসেবে গ্রহণ করে এর সম্ভাব্য চিহ্নগুলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখক মনে করেছেন সাম্প্রতিক দশকগুলোতে সাহিত্যপাঠের যেসব প্রণালিপদ্ধতি বিকশিত হয়েছে (যেমন: বিনির্মাণবাদী সমালোচনা পদ্ধতি) সেভাবে এই পাঠটি বিশ্লেষিত হয়নি। এখানে লেখকসত্তা বা পাঠ রচয়িতার 'মানস'কে গুরুত্ব দিয়ে টেক্সটির ব্যঞ্জনার্থ (denotation)-কে ছাপিয়ে প্লট এর ভাবার্থ (connotation) কতটা তাৎপর্যপূর্ণ তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চিহ্নবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় পাঠ বিশ্লেষণ (textual analysis), এখানে একটি নির্দিষ্ট পাঠ-এর ভেতর অনেকগুলো সম্ভাব্য ছোট পাঠ (subtext) থাকতে পারে বলে ধরা হয় এবং ক্রমান্বয়ে সামগ্রিক পাঠ-এর বিশ্লেষণ করা হয়। এদিক থেকে বিচার করলে আলোচ্য প্রবন্ধটি একটি পাঠ বিশ্লেষণ এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে।

কাবেরী গায়েন মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী নির্মাণ' (২০১৩) শীর্ষক একটি বই লিখেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর বহুমাত্রিক এবং অসামান্য অবদানকে প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসে স্বীকৃতি তো দেয়নি বরং তাঁদের ওপর নেমে আসা ইতিহাসের সব নির্যাতনকে দলিলবদ্ধ করা হয়েছে 'সম্ভ্রমহানিত্ব হিসেবে। এমনকি সাম্প্রাতিক প্রবণতাতেও চলচ্চিত্রে এসব নারীদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরণের ছোঁয়া পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নারীদের যে অবদানের কথা ইতিহাসের আখ্যান থেকে সরে গিয়েছে, তাদেরই স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক জাতির কাছে তাদের প্রকৃত সত্তার উপস্থিতি উপস্থাপনের লক্ষ্যে কাবেরী গায়েন মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী নির্মাণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন।

প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-পরবর্তী পাঁচটি তরঙ্গে ভাগ করে ২৬ টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও ৭টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নারী চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণ পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে 'চলচ্চিত্রের সেমিওলজি'। বিশাল চিহ্নজগতে চলচ্চিত্রের ডিসকোর্স গৃহীত হয় কোড হিসেবে। রঁলা বার্থ-এর 'চিহ্নায়ন সজ্জা' তত্ত্বের ভিত্তিতে লেখক চেষ্টা করেছেন চলচ্চিত্রের ডিসকোর্স বিশ্লেষণ করতে। দেশকে মায়ের সাথে তুলনা করে, তার জন্য যুদ্ধে যাওয়া অমূল্য অবদানকারী বাঙালি নারীদের ইতিহাসের পাতায় এবং নতুন প্রজন্মের কাছে সঠিক স্থান দেওয়ার লক্ষ্যেই লেখক মূলত তার এই গ্রন্থটি রচনা করতে চেয়েছেন।

রঁলা বার্থ-এর মতে এই কোড/সংকেত কাজ করে 'মিথ' পর্যায়ে। প্রথম চিহ্নায়ন সজ্জা (first order of signification) এ ব্যবহৃত বাচ্যার্থ বা (denotation)-কে লেখক

বর্ণনাত্মক অর্থ বলেছেন এবং এই অর্থকে ছাপিয়ে নির্দিষ্ট সংস্কৃতির মতাদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নতুন মূল্যবোধ, বিশ্বাসকে সম্প্রসারিত বা গভীরতর অর্থ বলেছেন যা দ্বিতীয় চিহ্নায়ন সজ্জায় (second order of signification) ভাবার্থ বা (connotation) হিসেবে ব্যবহৃত। তিনি বলেন চলচ্চিত্রে নারীরা তাঁদের প্রকৃত সত্তা থেকে উৎখাত হয়ে গভীরতর বা সম্প্রসারিত অর্থের স্তরে উন্নীত হয় যা মূলত মিথ স্তরে ধাবিত করে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত নারী চরিত্র (বীরাঙ্গনা, ধর্ষিতা) উল্লেখপূর্বক তিনি দেখিয়েছেন যে, নারীরা উপস্থিত হন ব্যক্তি হিসেবে কিন্তু বর্ণনাত্মক এই স্তর পেরিয়ে পুরুষতন্ত্রের চাহিদায় সম্প্রসারিত ডিসকোর্সের কাছে তাদের অস্তিত্বের নিজস্ব ডিসকোর্স চাপা পড়ে যায়। সেমিওলজির তত্ত্ব ব্যবহার করে নারীবাদী চলচ্চিত্রে নারীকে কীভাবে উপস্থাপন করা হয় সে বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি দেয়া সম্ভব বলে লেখক মনে করেন। বইয়ের অপর একটি অধ্যায়ে চলচ্চিত্রের নারীকেন্দ্রিক দৃশ্যের ডিসকোর্স বোঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে। সোস্যুরের দ্যোতক-দ্যোতিত বৈপরীত্য ধারণার সঙ্গে বার্থ ও হাল (Hall)- এর বর্ণনাত্মক ও সম্প্রসারিত অর্থ এবং পার্সের সেমিওটিক ধারণাগুলো ব্যবহার করে এ অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রের বাছাইকৃত কিছ দৃশ্যের অর্থ তৈরির মাধ্যমে 'চলচ্চিত্রের নারী নির্মাণ' ডিসকোর্সটি বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশে সেমিওটিক চর্চার ক্ষেত্রে এই আঙ্গিকে চলচ্চিত্রের ডিসকোর্স বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে মৌলিক এবং তা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তুলে ধরে।

এছাড়াও চিহ্নবিজ্ঞান এর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত অন্য একটি ধারণা 'মিথ' (myth)। চিহ্নায়ন এর মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য মিথ একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। রোঁলা বার্থ নির্দেশিত দুই সজ্জার চিহ্নায়ন (two orders of signification) এর মধ্যে দ্বিতীয় সজ্জার একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় মিথ। ভাবার্থ বা connotation যখন প্রাকৃতিক/স্বাভাবিক (naturalised) হয়ে যায়, তখন তাকে 'myth' বলে। 'স্বাভাবিক' বলতে মূলত বহুল ব্যবহারে সংস্কৃতির অংশে পরিণত হওয়াকে বোঝায়। চিহ্নমগুলে অবস্থিত চিহ্নগুলোর প্রকৃত অবস্থান বা তাৎপর্য বোঝার জন্য এটি একটি অত্যাবশকীয় উপাদান। বাংলায় মিথ সংক্রান্ত বেশ কিছু লেখকের স্বরোচিত এবং অনুবাদ গ্রন্থ পাওয়া যায়, যেমনঃ 'মিথ এন্ড মিনিং', 'নির্বাচিত রচনা ক্লোদ লেভি স্ত্রাউস', 'মিথ সংখ্যা নৃ' ইত্যাদি। বইগুলোতে মূলত ক্লদ লেভি স্ত্রাউস এর মিথ চিন্তা বিষয়ক আলোচনাগুলোই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাপ্ত গ্রন্থগুলোর আলোচ্যসূচী হলো - মিথ আর বিজ্ঞানের সম্পর্ক, আদিম চিন্তন ও সভ্যমন, গন্নকাটা ও যমজঃ মিথের বহুধা বিস্তার, মিথ আর সঙ্গীত, ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বে আকরণবাদী বিশ্লেষণ ইত্যাদি। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে যে সকল মিথ বা কল্প-কাহিনী প্রচলিত রয়েছে তাদেরই প্রকরণগুলো আলোচিত হয়েছে এই বইগুলোতে। প্রথাগতভাবে মিথ বলতে যা বোঝায় তা প্রকৃতরূপে অনুধাবনের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এগুলো তথ্যপূর্ণ; কিন্তু, চিহ্নবিজ্ঞানে মিথ এর যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, সেদিক থেকে বিচার করলে এসব গ্রন্থগুলোর মিথ আলোচনা অপূর্ণ বলে ধরা যায় এবং চিহ্নবৈজ্ঞানিক আলোচনার এদের অবদান সীমিত।

৪. উপসংহার

উপরে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত চিহ্ন ও চিহ্নবিজ্ঞান সম্পর্কে যেসকল আলোচনা করা হলো সেগুলোতে মূলত যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে তা হলো- চিহ্নবিজ্ঞানে সোস্যুরীর তত্ত্ব- যার ভেতর আছে দ্যোতক-দ্যোতিত, আপতিকতা, কালকেন্দ্রিক-কালানুক্রমিকতা, ভাষাতাত্ত্বিক মূল্য (linguistic value) এবং সস্যুরের অন্যান্য ভাষা চিন্তা (লঁগ/প্যারোল), দ্যোতক-নির্দেশিত সম্পর্ক আলোচনা করেছেন কেউ কেউ। সি.এস.পার্স এর চিহ্নবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সেভাবে আলোচিত না হলেও প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর প্রতীক, সূচক এবং প্রতিমা নামক চিহ্নের শ্রেণিগুলো। গুরুত্বসহ আলোচিত হয়েছে রোঁলা বার্থ নির্দেশিত চিহ্নায়ন (signification) ধারণাটি এবং এর সাথে প্রাসঙ্গিকভাবেই ব্যঞ্জনার্থ (denotation) এবং ভাবার্থ (connotation) আলোচিত হয়েছে।

তাছাড়াও সাহিত্য বিশ্লেষণে চিহ্নবিজ্ঞানের কিছু ধারণার প্রয়োগ দেখা যায় বিশেষত, প্রতীক, প্রতিমার ব্যবহার এবং শ্রেণিগত (paradigmatic) ও পরম্পরাগত বা রৈখিক (syntagmatic) বিন্যাস এর প্রয়োগ। প্রসঙ্গত আনা হয়েছে মিথ বিষয়ক আলোচনা। চিহ্নবিজ্ঞান সম্পর্কে মৌলিক ধারণা দেওয়া এবং এর তাত্ত্বিক কাঠামো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ওপরের আলোচনাগুলো পথ প্রদর্শক হিসেবে গণ্য হতে পারে। তবে চিহ্নবিজ্ঞানের সার্থকতা মূলত এর প্রয়োগের মধ্যেই, তাই তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি বিস্তারিতভাবে এর প্রয়োগক্ষেত্র এবং গুরুত্ব তুলে ধরার প্রচেষ্টা প্রয়োজন। উপরন্তু, প্রাপ্ত আলোচনাগুলো থেকে দেখা যায় একই ধারণা প্রকাশক অনেকগুলো পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন: arbitrary = আপতিক, আর্বিত্রিক, অবাধ, স্বেচ্ছাচারী; syntgamtic = পরম্পরাগত, ন্যাসগত, আনুষঙ্গিক ইত্যাদি)। একটি জ্ঞানশাখার মৌলিক ধারণাগুলো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে লেখকভেদে নিজস্ব পরিভাষা না মেনে যদি কিছু সাধারণ (common) পরিভাষা অনুসরণ করা হয়, তাহলে অর্থগত দ্ব্যর্থবোধকতা দূর হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

ড. অভিজিৎ মজুমদার। ২০০৭। *শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব*। 'কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

জেফারসন, অ্যান, ডেভিড রোবে, অন্যান্য। ২০০৩। *বিশ শতকের সাহিত্য তত্ত্ব* (বাসার আফজালুল, অনু.)। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

উদয় নারায়ণ সিংহ। ২০১০। *সাহিত্যের ভাষা: ভাষার সাহিত্য*। কলকাতা : অনিল আচার্য।

কাবেরী গায়েন। ২০১৩। *মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী- নির্মাণ*। ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড।

তপোধীর ভট্টাচার্য। ২০০৫। *সময়ের প্রত্নতত্ত্ব ও অন্যান্য*। কলকাতা : জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী।

-- ২০০৭। *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*। ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী।

মঈন চৌধুরী । ১৯৯৭ । *সৃষ্টির সিঁড়ি* । ঢাকা: নদী পাবলিশিং এ্যান্ড মিডিয়া হাউস ।

-- ২০০৪ । *ইহা শব্দ* । ঢাকা: দিব্য প্রকাশ ।

মিহির ভট্টাচার্য । ১৯৯২ । সেময়লজি/ সেমিয়টিক্ । *প্রসঙ্গ: ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান* । সমীরণ মজুমদার(সম্পা.) । কলকাতা: নিউ সুধীর নারায়ণী প্রেস ।

মোহাম্মদ আজম । ২০১১ । 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' পাঠের রকমফের পাঠবিবিধতার নন্দনতত্ত্ব । *সাহিত্য পত্রিকা* । বর্ষ ৪৮, সংখ্যা: ১-২ । পৃ. ৩৩-৫১ ।

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও মোসাম্মৎ মনিরা বেগম । ২০১০ । চিহ্নবিজ্ঞানে সোস্যুরীয় তত্ত্ব । *কলা অনুষদ পত্রিকা* । জুলাই ২০০৮- জুন ২০১০ । পৃ. ৬৩-৭০ ।

রমা প্রসাদ দাস । ২০১১ । *শব্দ ও অর্থ শব্দার্থের দর্শন* । ঢাকা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ।

শিশির ভট্টাচার্য্য । ২০১৩ । *অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ* । ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী ।

সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান । ২০০৮ । *উপমা- চিত্রকল্প ও প্রতীক চিহ্নের নন্দনতত্ত্ব* । ঢাকা: বাংলা একাডেমি ।

Arif, Hakim. 2013. BEE hand gestures reflecting Bengali culture. *Southern Semiotic Review*. Issue 1. Pg. 92-107.

--2013. Semiotics as a Global Discipline. *Chinese Semiotic Studies*. Issue 9. Pg. 88-95.

-- 2004. Woman's body as a color measuring text: A signification of Bengali culture. *Semiotica*. Issue 150-1/4. Pg. 579- 595.

Brier, Soren. 2007. *Biosemiotics*. UK: Pergamon press.

Bulut, T. 2005. Visual Semiotics and Interpretation in the Television Commercial *Semiotique Appliquee. Vol. 6.*

Chandler, Daniel. 2002. *Semiotics for Beginners*. UK: Routledge.

Danesi, Marcel. 2000. *Semiotics in Language Education*. New York: Mouton De Gruyter.

Jakobson, Roman, Morris Halle. 1971. *Fundamentals of Language*. Oxford: Blackwell Publishing.

Najafian, Maryam, Saeed Ketabi. 2011. Advertising Social Semiotic Representation: A Critical Approach. *International Journal of Industrial Marketing*. 2011, Vol. 1, No. 1.

Nazarova, Tamara. 1996. Linguistic and Literary Semiotics. *Semiotique Appliquee*. 1:1, 1996.19-28

Olclay, sert. 2006. Semiotic Approach and its Contribution to English Language Learning and Teaching. Hacettepe Üniversitesi E□itim Fakültesi Dergisi 31, 106-114